শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক; আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে অন্য কারু, অর্থাৎ সংসারের হয়েন! তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন ঃ

কথা বলতে ডরাই; না বললেও ডরাই।
মনের সন্দ হয়; পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই ॥
আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর।
এখন মন তোর; যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই ॥

"আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর; এখন মন তোর।" অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাক,—তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য; তাঁকে না লাভ করলে কিছুই হলো না! **এই মহামন্ত্র।**

আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদ্‌যোগ হইতেছে। হলঘরের একপাশে একটি ব্রাহ্মভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন; বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন। আর মেয়েরাও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জলসেবা হইল। এইবারে তিনি গাড়িতে উঠিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা সকলেই গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কমলকুটির হইতে গাড়ি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগরের বাটী

আজ শনিবার, (২১শে) শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই অগস্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ি করিয়া বাদুড়বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাস্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাস্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরকম 'পরমহংস'? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন? মাস্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না।

www.udbodhan.org

অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ি রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাস্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও-সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরেজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নিচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাব-পত্রের খাতা, দু-চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ওই কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট-বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে-পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে— তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়তো লিখিয়াছে, আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হইবে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরিব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না—আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। মাস্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘‘জামার বোতাম খোলা রয়েছে,—এতে কিছু দোষ হবে না?’’ গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতা। মাস্টার বলিলেন, ‘‘আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।’’ বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

www.udbodhan.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তরপার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণপার্শ্বে ও পশ্চিমপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬/১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা, গায়ে একটি হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতো কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়,—দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম—বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, "আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে, পড়াশুনা করি, কিন্তু কই তা হলো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।" দ্বিতীয়—দয়া সর্বজীবে, বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়িতে চড়িতেন না— ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন, একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়—স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপালের) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ—লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়ো ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত। পঞ্চম—মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আস তাহলে আমার ভারী মন খারাপ হবে, তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত! বলিলেন, মা, এসেছি!

[শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ]

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাব। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে—বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশুনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, ঋষির অন্তর্দৃষ্টি; ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিতেছেন, "মা! এ-ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!"

যে-ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর

www.udbodhan.org

বলিতেছেন?

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন ও মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা, আনুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাস্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না।" ঠাকুর একটি ভক্তছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "এ-ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়!"

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য) তুমি ক্ষীরসমুদ্র! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর—তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

[বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম—"তুমিও সিদ্ধ পুরুষ"।]

"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে— কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান-লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।"

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

www.udbodhan.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণপদকাদি (Medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম-বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাস্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।" হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, বাঙলায় যে-সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে 'শ্রীশ্রীহরিশরণম্' ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাস্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, "তাঁকে তো জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড় দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম—বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

[Problem of Evil—ব্রহ্ম নির্লিপ্ত—জীবেরই সম্বন্ধে দুঃখাদি]

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি—এ-সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

[ব্রহ্ম অনির্বচনীয় অব্যপদেশ্যম্—The Unknown and Unknowable]

"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি **ব্রহ্ম**। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি)—বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে, বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাপ! তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?" বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগল! বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে

www.udbodhan.org

হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, ''বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।''

''মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল, যাবার সময় ভাবছে—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

''যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও-পিঁপড়ে— চিনির আট-দশটা দানা না হয় মুখে করুক।''

[ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ—নির্বিকল্পসমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান]

''তবে বেদে, পুরাণে যা বলেছে—সে কিরকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ-সাগরে নামেন নাই। এ-সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।

''সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।

''লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছল। (সকলের হাস্য) কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হলো না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?''

একজন প্রশ্ন করিলেন, ''সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না?''

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি)—শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

''যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুনগুন করে।''

''পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য) তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়।'' (হাস্য)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—এই তিনের সমন্বয়—Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism.

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া—এ-সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত।

www.udbodhan.org

''কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ-অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ-অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

''জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি—সেই ইঁট, চুন, সুরকিতেই, সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

''ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

''জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য—সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। **তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।**

''বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

''বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান—এ-সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত!'' (সকলের হাস্য)

[বিভুরূপে এক—কিন্তু শক্তিবিশেষ]

''দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কতরকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কতরকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশি শক্তি, কারু কম শক্তি।''

বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য) তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ-কথা মানো কি না? [বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।]

[শুধু পাণ্ডিত্য, পুঁথিগত বিদ্যা অসার—ভক্তিই সার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় ''ওঁ রামঃ'' লেখা রয়েছে, আর কিছুই লেখা নাই!

''গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব

www.udbodhan.org

আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

“চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন—দেখলেন, একজন গীতা পড়ছে। আর-একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ-সব বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এ-সব কিছু বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বললে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ভক্তিযোগের রহস্য—The Secret of Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেঁক্ড়ি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)

“জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে! স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড়্দুড় করছে। জীবের আমি লয়েই তো যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা' (আমি) 'হাম্বা' (আমি) করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়—তখন খুব পেটে। (হাস্য)

“তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু' 'তুঁহু' (অর্থাৎ 'তুমি', 'তুমি')। যখন 'তুমি', 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা।

“রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

“সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।”

[বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা—“আমি ও আমার” অজ্ঞান]

“আমি ও আমার এই দুটি অজ্ঞান। 'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এই সব ঐশ্বর্য'—এই যে-ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ-সব তোমার জিনিস—বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব—এ-সব তোমার জিনিস'—এ-ভাব জ্ঞান থেকে হয়।

“মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি— কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ-বাগানটি আমাদের', 'এ-পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)

“ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব'—তখন একবার হাসেন; এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা—এ-কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এদিকটা

www.udbodhan.org

আমার, ওদিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর-একবার হাসেন; এই মনে করে হাসেন, আমার জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এ-জায়গা আমার আর তোমার'।"

[উপায়—বিশ্বাস ও ভক্তি]

"তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—"আচ্ছা, তোমার কি ভাব?"

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব।" (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন ঃ

[ঈশ্বর অগম্য ও অপার]

কে জানে কালী কেমন?
  ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জানো কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

"দেখলে, কালীর 'উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জানো কেমন'! আর বলছে, 'ষড় দর্শনে না পায় দরশন'—পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

[বিশ্বাসের জোর—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক]

"বিশ্বাস আর ভক্তি চাই—বিশ্বাসের কত জোর শুন ঃ একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হবে, বিভীষণ বললে, এই জিনিসটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে লও। তাহলে নির্বিঘ্নে চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু খুলে দেখো না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাবছে, বিভীষণ এমন কি জিনিস বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি? এই বলে কাপড়ের খুঁটটি খুলে দেখে, যে শুধু 'রাম' নাম লেখা একটি পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ, এই জিনিস! ভাবাও যা, অমনি ডুবে যাওয়া।

"কথায় বলে হনুমানের রামনামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে 'সাগর লঙ্ঘন' করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হলো!

"যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তাহলে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।"

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন ঃ

www.udbodhan.org

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য—The End of life

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।

এ-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন ঃ

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি-সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরি, ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম-নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥

[ঠাকুর সমাধি মন্দিরে]

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জলিবদ্ধ! দেহ উন্নত ও স্থির! নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন! সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন।—“ভাব ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই ‘মা’ বলে ডাকছে।

“প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥

“রামপ্রসাদ মনকে বলছে—‘ঠারে ঠোরে’ বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি **মা** বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

“ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকাশক্তি বুঝা যায়; দাহিকাশক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়।

“তাঁকেই ‘মা’ বলে ডাকা হচ্ছে। ‘মা’ বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোন ঃ

www.udbodhan.org

[উপায়—আগে বিশ্বাস—তারপর ভক্তি]

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয় ॥
কালীপদ-সুধাহ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ, কিছুই কিছু নয় ॥

"চিত্ত তদগত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। 'সুধাহ্রদ' কিনা অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ-যে সুধার হ্রদ! অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না—অমর হয়।"

[নিষ্কামকর্ম বা কর্মযোগ ও জগতের উপকার—Sri Ramakrishna and the European ideal of work]

"পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এ-সব কর্মের বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"তুমি যে-সব কর্ম করছ, এ-সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়।

"কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য) তুমি যে-সব কর্ম করছ এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু-ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে-লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।"

[নিষ্কামকর্মের উদ্দেশ্য—ঈশ্বরদর্শন]

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বউ-এর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; ওইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

"আরও এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল;—ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দনগাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দনগাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। এই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।

www.udbodhan.org

"নিষ্কামকর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!" (সকলে নিঃশব্দ)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

সকলে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—এ-যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য) বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম (সকলের হাস্য)—বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর—সে কি! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য) খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)

মাস্টার (স্বগতঃ)—নবানুরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান-অপমান বোধ থাকে না বটে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণসঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মূলমন্ত্র করে জপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। **অহেতুক কৃপাসিন্ধু!** বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পৌঁছিলেন, সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে

www.udbodhan.org

বাঙালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬/৩৭, মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ি, পরনে কাপড়, মোজা, জামা। চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন, পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, ''বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?''

বলরাম (সহাস্যে)—আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভিতরে কেন যাও নাই?

বলরাম—আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা।[এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়িতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাস্টারের প্রতি মৃদুস্বরে)—ভাড়া কি দেব?

মাস্টার—আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ি উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারাদি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, অমাবস্যা, (২৯শে শ্রাবণ ১২৮৯) ১৩ই অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৫টা হইবে।

শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যে, হালিসহরে বাটী। সরকারী অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করিতেন। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন; সে-সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী তাঁহার সহিত সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় আলাপ করিতেন। ঈশ্বরের কথা শুনিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।

ঠাকুর নিজের ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাস্টার প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। কেদার আজ উৎসব করিয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ আনিয়াছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। গানের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন। মাস্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহার পাদমূলে বসিয়াছিলেন।

[সমাধিতত্ত্ব ও সর্বধর্ম-সমন্বয়—হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান]

ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে সমাধিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, ''সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন। মৌমাছি ভনভন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মত্যাগ করলে হবে না। পূজা, জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, কবচাদি, তীর্থ—সবই করতে হয়।

www.udbodhan.org